ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 85- 92
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.183

‘সেই পাখি’ উপন্যাসের কাহিনি ও শিল্পরূপ: লেখক সন্তোষকুমার ঘোষের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ পর্যালোচনা

অশোককুমার রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 26.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Among SantoshKumar Ghosh’s remarkable novels such as ‘*Kinu Gowalar Goli*’, ‘*Shesh Nomoskar Shricharoneshu Ma-ke*’, ‘*Swayang Nayak*’, and ‘*Jal Dao*’, the novel ‘*Sei Pakhi*’ occupies a significant place. In this work, Ghosh demonstrates distinct variety in both narrative structure and artistic form. Within literary studies, particularly in the analysis of novels, narrative design and artistic form are considered essential components. The artistic form of a novel reflects the individuality of the author, manifested through language, style of expression, choice of words, rhythm, and imagery.

On the other hand, the narrative serves as the backbone of the novel. In ‘*Sei Pakhi*’, the narrative revolves around the character of Arindam—a murderer as well as a patient—who is interrogated by the psychologist Mandira. This technique of interrogation distinguishes the novel from others in Ghosh’s oeuvre. The climax centers on why and how Arindam committed murder. Equally compelling is the psychological dimension: how Arindam, as an accused, is influenced by Mandira, and conversely, how Mandira herself exerts psychological impact on him. Such dual perspectives enrich the narrative depth.

Furthermore, the use of flashback technique adds complexity and dramatic tension to the storyline. Hence, the central aim of this research article is to analyze how Santosh Kumar Ghosh, through *Sei Pakhi*, has introduced new dimensions in both narrative construction and artistic form.

Keywords: Novel, Narrative, Murderer, Psychologist, Artistic Form

নিজের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করে আনন্দ খুঁজে পাওয়ার অন্য নাম সাহিত্য। সাহিত্যিক আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। কথাসাহিত্য তার ব্যতিক্রম নয়। তাই লেখক উপন্যাসে বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেতে চান। পাঠকেরাও হয়ে উঠেন সঙ্গের সাথী। সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, লেখকের নিজস্ব উপস্থাপনভঙ্গির নানা দিক এই উপন্যাসের বিষয় হয়ে উঠে। তাই ঔপন্যাসিক নিজেই এই উপন্যাসের কাহিনি-বিন্যাস সম্পর্কে বলেছেন—

> “যে যা বলে, আর যে যা জবাব দেয় সেইসব ঝরে পড়া ফুলগুলো কুড়িয়ে, গেঁথে নিয়ে তবেই তো গল্প-উপন্যাসের মালা গাঁথা হয়! আমি নিয়মের একটু বাইরে যেতে চাইছি, যে যা বলেনি কিন্তু বলতে পারত, এই কাহিনিতে তারও কিছু কিছু জুড়ে দিতে চাইছি।”[১]

এই উপন্যাসে লেখক কাহিনি বিন্যাসে ও শিল্পরীতি বর্ণনায় নতুনত্ব এনে সমকালীন লেখকদের থেকেও স্বতন্ত্রের দাবী রাখেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথায় বলা যেতে পারে—

> "... ভাবের এবং রূপের সমবায়ে, সমগ্রতায় সে আপনার অস্তিত্বেরই চরম গৌরব ঘোষণা করতে থাকে স্থায়ী কালের বৃহৎ ক্ষেত্রে এ'কেই আমরা ব'লে থাকি সাহিত্য।...সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য, অর্থাৎ সম্মিলন।"[২]

তাই লেখক তাঁর মননশীল ভাবনাকে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস ও শিল্পরূপের মধ্যে দেখিয়েছেন। বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে আলোচিত 'সেই পাখি' উপন্যাসে সেই দিকটি মুখ্য অনুসন্ধান ও আগ্রহের বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি:

গবেষণাকর্মটি প্রস্তুত করতে বিশ্লেষণাত্মক ও বর্ণনামূলক পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। তথ্য আহরনের ক্ষেত্রে মূল উৎস হিসেবে আকর গ্রন্থ এবং গৌণ উৎস রূপে সহায়ক গ্রন্থরাজির সাহায্য নেওয়া হয়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকা, ও বিষয়ভিত্তিক সহায়ক বইয়ের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ফলে যাবতীয় তথ্য সমূহের সাহায্য নিয়ে বিশ্লেষণের মাধ্যমে পত্রটিতে একটি নিটোল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতিগতভাবে প্রচেষ্টা থাকবে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বাংলা সাহিত্যের আসরে উপন্যাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই উপন্যাস নিয়ে নতুন রূপে কাহিনি-বিন্যাস ও শিল্পরূপ নিয়ে আলোচ্য উপন্যাসটির তেমন কোনো আলোচনা নেই। তাই আমাদের নির্বাচিত উপন্যাসে এই অনুষঙ্গ নিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে। ফলে একদিকে যেমন লেখকের স্বতন্ত্র দিকটির প্রতিফলন ঘটে অন্যদিকে এই উপন্যাসটি কাহিনি বিন্যাস ও শিল্পরূপ বিশ্লেষণে বিশেষ তাৎপর্যের দাবী রাখে।

বিশ্লেষণ:

এক

কাহিনি-বিন্যাস:

লেখকের 'সেই পাখি' উপন্যাসটি ঈশিতা ও অরিন্দমবাবুর উক্তিতে শুরু হয়েছে। পুরো গল্পটি উত্তম পুরুষে উপস্থাপন করেছেন লেখক। এই উপন্যাসে একটি বিশেষ দিক হল সিনেমার ভঙ্গিতে কাহিনি-বিন্যাস। কাহিনি বিন্যাসের পর্বগুলি পর্যায়ক্রমে লেখক যেভাবে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার নমুনা তুলে ধরা হল—

(ক) আমাদের মুভি ক্যামেরায় তখন তোলা ছবিগুলো এখন ডেভেলপ আর প্রিন্ট করে সাজিয়ে দেখছি।

(খ) এই মুহূর্তে আমাদের ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রাখুন... তবে সাবধান, শুধু অদৃশ্য হলেই চলবে না, নিঃশব্দও হতে হবে, কারণ মৌরী আর অরিন্দম- মনে রাখবেন, এদের দু'জনেরই শ্রুতি, ঘ্রাণ ইত্যাদি অতিশয় সংবেদনশীল।

(গ) তার চেয়ে চারজনের মধ্যে যে-কোনও একজনের চোখের কাছাকাছি ক্যামেরাটাকে রাখাই ভাল। (চারজন বলতে এখানে মৌরী, অরিন্দম, বেবি ও অঙ্কিতা কথা বলা হয়েছে)

(ঘ) এই রাস্তায় ক্যামেরা আর সাউন্ডট্র্যাক বয়ে বয়ে আমরা এতদূর এসেছি যে, ফেরা মুশকিল।

এই ভাবে কাহিনি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন লেখক। এক সময় লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "এটা যদি মাঝে মাঝে খাপছাড়াভাবে সিনেমার ধাঁচে লেখা না হত, তা হলে অব্যবহিত পূর্ববর্তী দৃশ্যে বেবিকেও যৎকিঞ্চিৎ ভূমিকা দেওয়া যেত।"[৩]

এই বিষয়েটিকে আরো প্রস্ফুটিত করতে সমালোচকের কথায় বলতে হয়—

> "উপন্যাসের সর্বস্ব হচ্ছে কথা, ফিল্মের হচ্ছে ক্রিয়া বা অ্যাক্শন। উপন্যাসের রস হচ্ছে কথোপকথকে, তার সূক্ষ্ম রসিকতায়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বা আবহাওয়া-রচনায়; ফিল্ম-এর হচ্ছে গতিতে, অঙ্গ-ভঙ্গিতে, চলমানতায়।...উপন্যাসের মাহাত্ম্য যত তার বিষয়বস্তুর গৌরবে,ততটা বর্ণনাকৌশলে নয়। ফিল্মের পক্ষে বিষয়বস্তুটা গৌণ, বিষয়বিবৃতিই বিধেয়।"[৪]

উপন্যাসের গাঁথুনিকে আরো মজবুত করতে অরিন্দমকে মাকড়সার জালের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মানুষ মাকড়সার মতো জাল বিস্তার করে নিজেকে তৈরি করার জন্য প্রস্তুত করে সমাজের নানা ক্ষেত্রে। আখ্যানের গতি এগিয়ে যেতে যেতে দেখা গিয়েছে উপন্যাসে মন্দিরা ছিলেন একজন মনোবিজ্ঞানী। তাঁর দিদি নন্দিতা ও জামাইবাবু হিমাদ্রি। প্রথম দৃষ্টিতে অরিন্দম সম্পর্কে মন্দিরার ধারণা—

> "ওই লোকটাকে দেখুন, দেখুন জামাইবাবু, কেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে।"[৫]

একটু পরেই দেখা যায় মন্দিরার মধ্যে প্রথম অরিন্দমকে দেখে যা যা তার শারীরিক পরিবর্তন ঘটে সেই বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন— "চোখের কোণে লাল হয়ে যাওয়া। মন্দিরা যেন 'জালে-পড়া খাবি-খাওয়া মাছের মতো ছটফটে ভাব তার।'"[৬] সেই অবস্থায় মন্দিরাকে দেখে অরিন্দমের মনে হয়েছে 'মন্দিরা যদি মোহানার কাছাকাছি কোনো নদী হত বা কোনো শীতের দিনের দু'প্রহর হত তাহলে ভাল হত'। গল্পের আখ্যান যত এগিয়েছে চরিত্রগুলি একে অপরের আরো কাছাকাছি এসেছে। শুধু মন্দিরার শারীরিক পরিবর্তন নয় অরিন্দমের মধ্যেও স্বরের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে মন্দিরার সঙ্গে কথা বলার সময়। দার্শনিক মনোভাবের মতো একজন নারীকে জানা সহজ নয় সেই দিকটি উপলব্ধি করতে পেরেছে অরিন্দম। অরিন্দম নিজের ব্যক্তি সত্তাকে গুলিয়ে ফেলেছে। তাই ঈশিতা আর মন্দিরাকে এক সঙ্গে ভাবনায় দাঁড় করিয়েছে। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন কম কথা বলা মেয়েটির নাম ঈশিতা। অরিন্দমের ছোট বেলার খেলার সঙ্গী ছিল সতী নামের একটি মেয়ে। অরিন্দম নিজেও দিশেহারা এক এক সময় অন্য অন্য মেয়েদের যে ভাবনা তার মাথায় ভর করে আসায়। এ প্রসঙ্গে আমরা জীবনানন্দ দাশের কথায় বলতে পারি—

> "মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়— কোনো এক বোধ কাজ করে।"[৭]

মানুষের মন কত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় সময়ে সময়ে এ বিষয়টি লেখক দেখিয়েছেন। অরিন্দম উপলব্দি করতে পেরেছে তার ভিতরে একটা 'মিস্টার হাইড' লুকিয়ে রয়েছে। অরিন্দম চরিত্রের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ভাবনার উন্মেষ হতে দেখা যায়। যেমন উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে—

> "কিন্তু যেই চলে যাই হাইডের কবলে, যেইমাত্র তার প্রজা হই, অমনই শুরু হয় তার হরেক অত্যাচার। আমারই অভ্যন্তরে জন্ম নেওয়া আমারই মনের কোনও স্তরে লালিত এবং পালিত হওয়া ওই সুপুষ্ট সত্তাটি আমাকে দিয়ে কি যা খুশি তাই করিয়ে নিতে পারে? — নারীহরণ, নারীধর্ষণ, এমনকী খুন?"[৮]

ঠিক তার একটু পরেই অরিন্দমের স্বরের পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। অরিন্দমের চোখে মন্দিরার শারীরিক বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

> "মন্দিরার পা দুটো এখন কাঁপছে, সবে দাঁড়াতে শেখা বাচ্চার মতো, এই ভরাভরতি যুবতী এখন টলমল, অচিরে স্থির হয়ে যাবে, ওর গিরিচূড়া আর উপত্যকাসমেত অন্তঃস্থলের ভূকম্পও থেমে যাবে নির্ঘাত"[৯]

মানসিক এই পরিস্থিতির মোহ জাল থেকে অরিন্দম বেড়িয়ে আসতে পারেনি। তাই দু'জনে একসময় শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। লেখকের বর্ণনায় অরিন্দম আর মন্দিরা শারীরিক সম্পর্কের কথা উপন্যাসের পাতায় দেখা গিয়েছে—

> "পালঙ্কে বসে অরিন্দম এখন দম নিচ্ছে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জরিপ করছে সারা ঘরের আর পায়ের কাছে দলা পাকানো জামা, পাজামা দুটো হাতড়ে নিয়ে খানিকটা ভব্য হয়ে সে এখন দেওয়ালে বিলম্বিত নগ্নিকা বিলাসিনীদের সঙ্গে চোখে চোখে কথা বলছে।"[১০]

আধুনিক মানুষের মন-মানসিকতার প্রতিফলন দেখা গিয়েছে অরিন্দম চরিত্রের মধ্যে। অরিন্দম এক জনের সঙ্গে সম্পর্কে থেকেও অন্য নারীদের সঙ্গ নিয়েছিল। আধুনিক কালে এই দিকটি স্বাভাবিক হয়ে পড়েছে মানুষের জীবনযাত্রায় এই প্রসঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কথায় বলা যেতে পারে—

> "আধুনিকতার মানেই নাকি খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—সভ্যতা ক্রমশ তাদের শেখাচ্ছে নতুন নতুন নিয়মকানুন এবং যৌনতাকে মুক্ত করে দেবার"[১১]

মন মানসিকতা। অরিন্দমের অন্য নারীদের নাম বেবি ও অঙ্কিতা ছিল। বেবির কাছাকাছি যাওয়ার কারণ বেবির গানের গলা ভালো ছিল। একজন মানুষ সবসময় পূর্ণতা পেতে চায় সেই বিশেষ দিকটি দেখা গিয়েছে অরিন্দমের মধ্যে। অরিন্দম পরে অঙ্কিতার কাছে যায় কারণ সে নৃত্যশিল্পী ছিল। লেখক উপন্যাসে ছেলেদের মদ্যপানের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের মদ্যপানের দিকটিও দেখিয়েছেন—

> "তোর একটু দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই বেবি। হুঁশ নেই, এখনও টলছিস। আজ সন্ধে থেকে বল তো, ক' গেলাস গিলিছিস?"[১২]

উপন্যাসের মাঝে এসে দেখা যায় অরিন্দম মানসিক রোগী ছিল। উপন্যাসের অন্য একটি চরিত্র হিমাদ্রি। মন্দিরার জামাইবাবু তার কথা আমরা আগেই পেয়েছি। অরিন্দম যে মানসিক রোগী হিমাদ্রির কথায় তা খানিকটা ধরা পড়েছে—

> "এমনিতে এত ডিসেন্ট এই অরিন্দম ছেলেটি, অথচ মাঝে মাঝে ওর কী যে হয়, হঠাৎ একেবারে এলোমেলো পাগল হয়ে যায়।"[১৩]

এর পরেই জানা গিয়েছে অরিন্দমের মৌরী নামের এক নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল। মৌরী ছিল একজন অভিনয়শিল্পী। উপন্যাসে মাঝে মাঝে তাকে যাত্রাদলে পার্ট করতে দেখা গিয়েছে। এই বিশেষ দিকটি ধরা পড়ে উপন্যাসের সংলাপ থেকে—

> "... আমি যদি এখন জনার পার্ট করি, তবে তুমি কী হবে? পারবে এক লাইনও অ্যাকটিং করতে?"[১৪]

উপন্যাসের শেষে দেখা গিয়েছে এক রাতে অরিন্দমবাবু মৌরী ওরফে হিমা নামে একটি মেয়েকে গলায় মুক্তোর মালা জড়িয়ে প্যাঁচ দিয়ে খুন করে। গলায় মালা প্যাঁচ লাগায় হিমা শ্বাসরোধ হয়ে মারা যায়। মনোবিজ্ঞানী মন্দিরা মনে করেন অরিন্দমের সংস্পর্শে যেসব মেয়ে আসে সকল মেয়েই মরে কোনো না কোনো ভাবে। এই কথার মধ্যে একটা দার্শনিক তত্ত্ব লুকিয়ে আছে। শুধু শারীরিক ভাবে নয় মানসিক ভাবেও মরে মেয়েরা। অরিন্দম জীবনে অনেক নারীর সঙ্গে মিশেছে। শৈশবে সতী পরে যশোমতী নামে এক বিধবা দাইয়ের সঙ্গেও। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই কাহিনি অবলম্বন করে বলা যেতে পারে অরিন্দমই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। তার মন, আচার ব্যবহার উপন্যাসের কাহিনির আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞানী মন্দিরা প্রশ্ন রেখেছে অরিন্দমের কাছে—

> "দেবতারা যা বানিয়েছিলেন, আপনি কি তাই বানাতে চান, এই কলিকালে? পুরাণকে করতে চান আধুনিক?"[১৫]

এই জিজ্ঞাসা প্রতিটি আধুনিক মন-মানসিকতার মানুষের যারা নতুন ভাবে নিজেদের ভেঙে তৈরি করতে চান। উপন্যাসের শেষের এসে লেখক জানিয়েছেন—

> "প্রাথমিক বঙ্গোপন্যাসের কালে লিখিত হলে এই অংশটাকে বলা যেত উপসংহার। এই উপসংহারে কালি-কলম, ক্যামেরা-ট্যামেরা সমস্ত নিয়ে অন্তরালে হাজির হয়ে আমরা শুনলাম, কোনও মনোবিজ্ঞানীর সঙ্গে রোগী অরিন্দমের কথোপকথন।"[১৬]

এই ভাবে উপন্যাসের কাহিনি বিন্যাস হয়েছে। যা পাঠকের মনকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আর্কষণীয় করে তুলেছে।

দুই

শিল্পরূপ:

শিল্পরূপের মধ্যে রচনা শৈলীর দিকটি উঠে আসে। অষ্টাদশ শতকের ফরাসী চিন্তাবিদ বুফোঁর তাঁর 'Discourse Sur le style' গ্রন্থে বলেন 'style is the man himself' অর্থাৎ লেখকের সামগ্রিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে শৈলী বলতে 'শীল, স্বভাব'[১৭] এবং 'প্রজ্ঞপ্তি'[১৮] শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন। বিশিষ্ট শব্দ বা বাকভঙ্গির ব্যবহার সেই সঙ্গে অনুচ্ছদ সাজানোর দিকটি শৈলীতে ধরা পড়ে।

> "লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন"[১৯] বলা হয়ে থাকে। লেখক তাঁর চিন্তা, সংকল্প ও উপলব্দির মধ্য দিয়ে কর্মসাধনাকে সৌন্দর্যে পৌঁছে নিয়ে যান। "স্টাইল হল লেখকের দ্বারা সজ্ঞানে নির্বাচিত বা অবচেতনভাবে নিয়োজিত সেইসব ভাষাগত উপায় যে সবের দ্বারা তিনি পাঠকের সঙ্গে অভিপ্রেত যোগসাধন করেন।"[২০]

তবে দেখা যাবে লেখক "বক্তার সামগ্রিক প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়।"[২১] পরে তা পাঠকেরা সহজেই মেনে নিতে পারি। শৈলীর ক্ষেত্রে লেখক সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য সব দিকেই সর্তক দৃষ্টি রাখেন। তাই সমালোচকের কথাই বলা যেতে পারে—

> "স্টাইল বিচারে রচনার প্রতিটি শব্দ, সংযোজক অব্যয়, ক্রিয়া, যতি, বাক্য, অনুচ্ছেদ সমস্ত এমনকি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ জাতধ্বনি বা ধ্বনিপুঞ্জ সমস্তই অতিসূক্ষ্ম ও সতর্ক বিশ্লেষণীয়। চিত্রকল্প, ভাষণ, কলা, সব জড়িয়ে স্টাইল।"[২২]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শিল্পরূপের নানা দিকের আলোচনা করা হয়েছে।

শব্দপ্রয়োগ:

তৎসম শব্দ:

তৎসম শব্দ সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন বলেছেন—

> "যে সকল শব্দ আধুনিক বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে অপরিবর্তিতভাবে গৃহীত হইয়াছে সেগুলিকে বলা হয় তৎসম। ('তৎ অর্থাৎ সংস্কৃতের 'সম' অর্থাৎ অভিন্নমূর্তি)"[২৩]

কিছু শব্দ উপন্যাসের পাতা থেকে তুলে ধরেছি।

আমরা অচিরেই উপনীত হই এমন একটি কোমল উপাধানের **সমীপে**।

আর ওই **স্নেহ**ক্ষরা নারী অবিলম্বে তার উত্তরও দিচ্ছে।

তৎসম অব্যয়: অদৌ, তৎসম বিশেষণ: পুষ্ট।

তদ্ভব শব্দ:

বাংলা শব্দভাণ্ডারের মৌলিক শব্দের একটি ভাগ হল তদ্ভব শব্দ। উপন্যাসে অনেক তদ্ভব শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়েছে কিছু উদাহরণ হল—মাছ, চাঁদ, মাথা, এগারো, হাত ইত্যাদি।

অনুকার শব্দ:

উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু অনুকার শব্দ হল যেমন—

ওই বেবির তাল-মান আর **মুদ্রা-টুদ্রা** সব নিখুঁত।

চোখের তারার **আনাচ-কানাচ** লাল করে ফেলছে।

তোমরা যাকে বলো **তটিনী-নটিনী**, সব হতে পারে।

নামের কৃতিমতা সত্ত্বেও অঙ্কিতা তো কনুই দিয়ে **গুঁতিয়ে-টুতিয়ে** ওই দৃশ্যটায় রাস্তা সাফ করে একটুখানি সামনে আসতে পেরেছে।

হয়তো সে আকাশের উপরদিককার স্তরের লঘুভার **হাওয়া-টাওয়া** নিয়ে কিছুই বলত না।

অন্ধকারে **হাসি-টাসি** দেখা যায় না।

অরিন্দম কোনও ধোঁয়াটে **পাপ-টাপ** নয়, দৃষ্টি-স্পর্শগ্রাহ্য একটি অপরাধ করেছে।

মানে, কোনও ঠাকুর, **বিগ্রহ-টিগ্রহ**, ছেলেবেলা থেকেই যার পায়ে আপনি দিয়ে এসেছেন অঞ্জলি?

একালের **গল্প-টল্প** সেই রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যস্ত।

পাপ-তাপ— এসব কথা তো বড় ধোঁয়াটে অরিন্দমবাবু।

প্রবাদ:

প্রবাদের মধ্যে থাকে যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও মননশীল চিন্তার প্রতিফলন। এই উপন্যাসে একটি বাংলা আর একটি ফরাসি প্রবাদ ব্যবহার হয়েছে।

বাংলা প্রবাদ: উরু দেখিয়েই ছ'মাস'

ফরাসি প্রবাদ: শার্সে লা ফাম

প্রশ্নবাচক বাক্য:

বর্যারও কি মানে বলে দিতে হবে?

কী বলে তোমার এই শাস্ত?

আপনি তখন বলেছিলেন কী?

আপনি ঈশিতা নন তো?

তবে তাকে কি দেখেছেন স্বপ্নে?

অব্যয় নিয়ে বাক্য শুরু:

কিন্তু সে বেচারার তখন নাক ডাকছিল।

অথচ বেবিকে তার একটুও ভাল লাগেনি।

পুনরুক্ত শব্দ:

সেকালে মেয়েদের পায়ের ঘায়ে অশোক গাছ **লাল লাল** ফুলে ছেয়ে যেত।

বিস্ময়সূচক শব্দ:

কী অদ্ভুত কথা বলো তুমি!

তিরতিরে ঝরনা নিয়ে এলাম বলো দিকিনি!
এতখানি সৃষ্টি আমিই তো করেছি!
সন্তোষকুমার ঘোষের উপন্যাসে একটি বিশেষত্ব 'খ' এর পরিবর্তে 'ক্ষ' এর ব্যবহার
আমি **কক্ষন**ও কি বলেছি যে আমি ঈশিতা?
এইখানেই মিল যতেক মক্ষিকার সঙ্গে **মক্ষী**রানিদের।
বারো আনা। **এক্ষুনি** উড়ে যাবে, এমন নন্দনবাসিনী নগ্নিকা প্রত্যেকটি।
মৌরীর মুখে ব্যবহার হওয়া "**তুম**" প্রত্যয়টি যা অরিন্দমকে ভাবিত করে তুলেছে।
এখানে আজানু অনাবৃত শব্দটির প্রাকৃত অর্থ করতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—উদলা।

প্রতীতির শব্দের ব্যবহার:

'সেই পাখি' উপন্যাসে লেখক একটি প্রতীতি শব্দের ব্যবহার করেছেন। প্রতীতি অর্থে নারীদের তিনি 'মহাজন' বলেছেন।

পৌরাণিক চরিত্র:

ঔপন্যাসিক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি উপন্যাসে ঘটনা প্রসঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করতে, ঘটনার গতিকে আরো প্রাণবন্ত করতে, পৌরাণিক চরিত্রের প্রসঙ্গ এনেছেন। এই উপন্যাসে তিনি মাত্র তিনটি পৌরাণিক চরিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি।

ছড়ার ব্যবহার:

ছড়া বলতে বোঝায় মুখে মুখে রচিত এক বিশেষ প্রকরণ। যার সঙ্গে লোকজীবনের সংযোগ থাকবে। উপন্যাসের চরিত্রের মুখে লেখক এই ছড়া বসিয়ে দিয়ে উপন্যাসের চরিত্রকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে তুলেছেন। এই উপন্যাসে ব্যবহৃত ছড়াগুলি হল—
ছেলে ঘুমোল, পাড়া জুড়োল বর্গি এল
ছেলে ঘুমোবে না যশোদা মাই

অনুপ্রাস অলঙ্কার:

একটি বর্ণ বা একগুচ্ছ বর্ণ বার বার ব্যবহৃত হয়ে যে শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করে, তাকে বলে অনুপ্রাস। এই উপন্যাসে দু'টি অনুপ্রাসের লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসে একটি অনুপ্রাস অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা গিয়েছে। যেমন—
ঝমর ঝম ঝমর ঝম

লোকসঙ্গীত:

বাংলা লোকসাহিত্যের ইতিহাসে লোকগান একটি বিশেষ স্থান জুড়ে রয়েছে। একটি লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সমকালীন সমাজের নানা দিক উঠে আসে। আনন্দ দানের পাশাপাশা মানব মনের চিরকালীন কথাকেই ধ্বনিত করে। সে দিক থেকে আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি লোকসংস্কৃতির দিকটিও। লোকগানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। যথা— ভাওইয়াইয়া, ভাটিয়ালি, গম্ভীরা, লালনগীতি, বাউল ইত্যাদি। 'সেই পাখি' উপন্যাসে লেখক ঝুমুর গানের প্রসঙ্গ এনে ঘটনাকে সুন্দর গতি প্রদান করেছেন।

চরিত্রের সংলাপে মাঝে মাঝে লেখক কবিতার ব্যবহার ঘটিয়েছে। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায় লেখক নিজেও কবিতা যেমন ভালবাসতেন। আসলে লেখক নিজেই কবিতার হাত ধরেই সাহিত্যে এসেছেন। এই উপন্যাসে চরিত্রের সংলাপ থেকে কবি কিরণধনের কবিতার অংশ তুলে ধরেছেন— 'বেলফুল চাই না, জুঁইফুল দাও' মাঝে মাঝে বিলিতি শাস্ত্র থেকে উক্তি ব্যবহার করেন উপন্যাসে—প্রভু যিশু তাঁর সারমন অব দ্য মাউন্ট-এ বলেছেন— 'এক গালে চড় খেলে আর একটা গাল বাড়িয়ে দাও'। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবিতার প্রসঙ্গ এনে রাধার অভিসার কথা বর্ণনা করেছেন। অভিসারের যাওয়ার সময় আওয়াজ যত কম হয় ততই ভাল এই দিকটির কথা তুলে ধরেছেন। লেখক নিজেও বিশ্বাস করেন 'তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে' যুগ যুগ ধরে নায়কের কাছে নায়িকারা অভিসার করেন। উপন্যাসে অরিন্দমের কাছে বার বার নারীগুলো এসেছিল। এ কিন্তু অভিসারের অংশই বলা যেতে পারে।

লেখক গ্রাম জীবনে শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন তাই মা, পিসিদের দেখেছেন কীর্তনে দলে যেতে। সেই দিকটিও উপন্যাসে তুলে এনেছেন তারঁ জীবন অভিজ্ঞিতা থেকেই। কীর্তন গানে উপন্যাসে 'আমি গোঠেমাঠে ধাই, ধবলী চরাই, তোমার প্রেমের কীই বা জানি।' এই অংশের কথা বলেছেন। মানব জীবনের নানা বিষয়গুলি এনে ঘটনা গতিকে শুধু প্রাণবন্ত করেনি তিনি সমকালীন সংস্কৃতিকেও ধরতে চেয়েছেন।

গানের ব্যবহার:

উপন্যাসে দেখা গিয়েছে চরিত্র মনের যে কথা সরাসরি বলতে পারে না সেই ক্ষেত্রে গানের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের মনের ভাব অন্যকে ব্যক্ত করে থাকে। কোনো কোনো উপন্যাসে দেখা গিয়েছে চরিত্রগুলি নিজেরা অন্যদের গান শুনিয়ে রোজগার করতে। 'রেণু, তোমার মন' উপন্যাসের অন্ধবালক নিজে গান গেয়ে রোজগার করেছিল। সঙ্গে রেণু দের মামাদের পরিবার চালিয়েছিল। 'কিনু গোয়ালার গলি' উপন্যাসে নীলা গান শুনিয়েছি অবিনাশকে। লেখক নিজে গান ভালো পেনেত রবীন্দ্র-সঙ্গীত। তার প্রতিফলন উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দেখা যাবে এটাই স্বাভাবিক। 'সেই পাখি' উপন্যাসে দেখা গিয়েছে অঙ্কিতা নামের মেয়েটি সেসব গান গেয়েছে তার তালিকা দেওয়া হল। যথা—
কাদের কুলের বউ, কাদের কুলের বউ।
নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি (রবীন্দ্রসঙ্গীত)
কে রয় ভুলে তোমার মোহন রূপে (রবীন্দ্রসঙ্গীত)

আর একটি বিশেষ দিক লেখক প্রথম **পপ সঙ** এর ব্যবহার ঘটিয়েছেন 'সেই পাখি' উপন্যাসে। তার নমুনা দেওয়া হল— ন্যাট কিং কোল ও হ্যারি বেলা হ্যারি বেলা। এই গানের ব্যবহার আধুনিক জীবনযাত্রায় বেশ প্রভাব দেখা যায়। লেখক দূরদৃষ্টি ছিলেন বলেই তার ব্যবহার অনেক আগেই উপন্যাসে করে যেতে পেরেছেন। এই দিকটি শিল্পরূপের নতুন দিক বলা যেতে সমকালীন সময়ে।

উপমার ব্যবহার:

উপমায় একটি বাক্যে স্বভাব ধর্মে বিজাতীয় দুটি পদার্থের কোনো একটি বিশেষ গুণ, অবস্থা কিংবা ক্রিয়ার সাদৃশ্য দেখানো হয়। শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী "উপমা কথাটির সাধারণ অর্থ তুলনা"[২৪] বলেছেন।
লেখক উপন্যাসে উপমা ব্যবহার করেছেন—
চালকুমড়োর ফালি সাইজের মতো জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ এনে।

চিঠির ব্যবহার:

বাংলা সাহিত্যের শুধু নয় মানব জীবনের একজন যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে পত্রের ব্যবহার। রত্নসেন, সূর্যমুখী, শচীশ, শশীডাক্তার সহ আরো অনেকের কথা মনে পড়ে বাংলা সাহিত্য পাঠে। সন্তোষকুমার ঘোষের লেখায় এই একটি বিশেষ দিক উপন্যাসের শুরু থেকে দেখা গিয়েছে। নীলা (কিনু গোয়ালার গলি), দেবাশীষ (নানা রঙের দিন), নিশীথ (সুধার শহর), সুনীল (ফুলের নামে নাম), প্রণব (শেষ নমস্কার শ্রীচরণেষু মা-কে) প্রভৃতি উপন্যাসে চিঠির ব্যবহার দেখা গিয়েছে। তার ব্যতিক্রম ঘটেনি আলোচ্য উপন্যাসেও।

উপন্যাসটি অরিন্দমের চিঠিতে শেষ হয়েছে—

> "ঈশিতা কে? সবাই জানতে চায়। আমি নিজেই যে জানি না। সে কি আমার কাছাকাছি কখনও ছিল, এসেছিল? তাও জানি না। এও সম্ভব, ঈশিতা নেই, কোথাও নেই, কখনও তার বিদ্যমানতা সম্ভবে না। একটি পুষ্পে কি আমরা সব পর্ণ, সব বর্ণ, সমুদয় দল আর সৌরভ আর বিকাশ—
> এই সকলই পাই? না। তেমনই একই অঙ্গে যত রূপই থাক, বিদ্যা, আর বিজ্ঞান, দর্শন আর শিল্প, সংগীত, নৃত্য, চারুকলা, চিত্তের সরসতা—এত গুণের সমন্বয় বা সহ-অবস্থিতি মেলে না। যে কর্ম-সহচরী, সে আবার নর্ম-সহচরীও কদাচিৎ ঘটে। শয্যাসঙ্গিনী যিনি, তিনি স্বপ্নসঙ্গিনীও হলেন, এ একরকম বিরল ঘটনা। এতই যদি বুঝি এই কঠিন সত্যের সীমান্তে যদি পৌঁছোতেই পেরেছি, তবে আর আমার কষ্ট কী? আচরণে, আচার-ব্যবহারে, কথাবার্তায়, ক্রিয়া-কাণ্ডে উনপঞ্চাশি পবনের প্রাবল্য, তথা পাগলামির উদ্‌ভ্রান্ত প্রাদুর্ভাব কেন?..."[২৫]

এই চিঠি উপন্যাসের মূল ঘটনাকে ব্যক্ত করেছে। এই চিঠি পড়ার পর পাঠকের সামনে লেখক নিজেই প্রশ্ন রেখে উপন্যাসটি শেষ করেন— "অরিন্দম বা অরিন্দমের মতো আরও অনেকে ছোট-বড় হরেক অপরাধ করে, করে চলে, সেটা ঠিক। কিন্তু যা অপরাধ, তাই কি পাপ? ইতি।"[২৬] পাঠককেও এই প্রশ্ন উপন্যাসে শেষে ভাবিত করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যেতে পারে Simpson paul তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Language through Literature: An Introduction' এ বলেছেন "...This highly erroneous view of stylistics is disseminated in different ways through the acadmic system"[২৭] উপন্যাসে কাহিনি ও শিল্পরীতি গুরুত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিশেষ দিকটি কখনও ভাষাগত দিকে থেকে কখনও চরিত্রের মনস্তত্ত্বের গভীর সংলাপের নিদর্শন থেকে আবার কখনও কাহিনি বিন্যাসের মধ্যদিয়ে উপন্যাসের আখ্যানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। অলোচ্য গবেষণা নিবন্ধটিতে কাহিনির বিন্যাস ও শিল্পরীতির সেই দিকটি দেখানো হয়েছে। যেখানে প্রকাশ পেয়েছে লেখকের নিজস্ব স্বতন্ত্রতাও যা সমকালীন লেখকগোষ্ঠী থেকে ভিন্ন রূপে তাঁকে প্রকাশ করে। তাঁর উপন্যাসের কাহিনি, আঙ্গিক ও শিল্পরূপ জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত।

তথ্যসূত্র:

১. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৪।
২. ঠাকুর, রবীন্দ্র। রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড) । বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৭, অগ্রহায়ণ ১৩১৭, পৃ. ৪৮৩।
৩. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৩৪।
৪. ঘোষ (সম্পা), দেবীপ্রসাদ। বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র চর্চা ১৯২৩-৩৩। সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা, সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পৃ. ৭৫।
৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৭১।
৬. তদেব, পৃ. ৬১৮।
৭. দাশ, জীবনানন্দ। কাব্য সমগ্র। এস. বি. এস. পাবলিকেশন, বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৪২৩, পৃ. ১২০।
৮. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬২২।
৯. তদেব, পৃ. ৬২৩।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩২।
১১. সিরাজ, সৈয়দ মুস্তাফা। সেরা ৫০টি গল্প। দে'জ পূনর্মুদ্রণ: ফাল্গুন ১৪২৩, পৃ. ২৮৬।
১২. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৪০।
১৩. তদেব, পৃ. ৬১৭।
১৪. তদেব, পৃ. ৬৩৩।
১৫. তদেব, পৃ. ৬৪০।
১৬. তদেব, পৃ. ৬৩৭।
১৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিচরণ। বঙ্গীয় শব্দকোষ, দ্বিতীয় খণ্ড(প-হ) । অষ্টম মুদ্রণ ২০১১, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, পৃ. ১৩০।
১৮. তদেব, পৃ. ১৩০।
১৯. রায়, অপূর্বকুমার। শৈলীবিজ্ঞান। প্রথম দে'জ সংস্করণ অক্টোবর ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৭।
২০. সরকার, পবিত্র। গদ্যরীতি পদ্যরীতি। প্রথম প্রকাশ ১৯৮৫, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৭২।
২১. শ, ড. রামেশ্বর। সাধারণ ভাশাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা। তৃতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা পৃ. ৪৬-৪৭।
২২. সেন, নবেন্দু। বাংলা গদ্য স্টাইলিস্টিকস। দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯০, পুস্তক বিপণী, কলকাতা, পৃ. ২৭।
২৩. সেন, সুকুমার। ভাষার ইতিবৃত্ত। আনন্দ, চতুর্দশ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৫৬।
২৪. চক্রবর্ত্তী শ্যামাপদ, 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা', কৃতাঞ্জলি প্রকাশনী, কল-৭৩, পুনর্মুদ্রণ—২০০৪, পৃ. ৪৫।
২৫. ঘোষ, সন্তোষকুমার। উপন্যাস সমগ্র (২) । আনন্দ। জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬৪০।
২৬. তদেব, পৃ. ৬৪১।
২৭. Paul, Simpson. Language through Literature: An Introduction. London, Routledge, Digital print 2022, p-2.